স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন সমন্বিত পরিকল্পনা

——— হীরেন পণ্ডিত———

একবিংশ শতাব্দীর এ পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে বিশ্বদরবারে দাঁড়াতে চাইলে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন তথা জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের মতো একটি জনবহুল দেশের জন্য এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, বর্তমান এ তথ্যপ্রযুক্তির যুগে জ্ঞানের ভিত্তিতেই কেবল এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে একটি উৎপাদনশীল জনশক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা; যিনি রাষ্ট্র পরিচালনা, নেতৃত্বের দক্ষতা, মানবিকতায় শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্বেই প্রতিষ্ঠিত। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি স্বপ্নের নাম; সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিক রূপ। বর্তমান সরকার নির্বাচনী ইশতেহারে ২০২১ সালের মধ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল। প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক চেষ্টা আর দূরদর্শী নেতৃত্বে সে স্বপ্ন এখন বাস্তবে পরিণত হয়েছে। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের ফলে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি ব্যবহার করে সব সুবিধা আজ আমাদের হাতের নাগালে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে আমাদের এ অবস্থানে পৌঁছানোর পথ খুব সহজ ছিল না। ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর জননেত্রী শেখ হাসিনা যখন রূপকল্প ২০২১ তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন, ঘোষণা দেন রূপকল্প ২০২১-এর, সে সময় তথ্যপ্রযুক্তিতে আমাদের দেশের অবস্থান ছিল পেছনের সারিতে। ওই সময়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার এ প্রস্তাবনা ছিল এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ডিজিটাল বাংলাদেশ মূলত জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান। ডিজিটাল প্রযুক্তির বহুমাত্রিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সূচকে শক্ত অবস্থানে পৌঁছেছে। একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য যে সমৃদ্ধ ও উন্নত জীবন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ তার সেই স্বপ্ন পূরণ করেছে।

সারা বিশ্ব এ মুহূর্তে একটি প্রযুক্তিগত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যাকে আমরা বলছি চতুর্থ শিল্পবিপ্লব। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষের জীবনমানকে আরও সহজতর করা। এর ফলে আমাদের জীবনযাত্রা এবং পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের পথ ও পদ্ধতিগুলো মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। ধীরে ধীরে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সবকিছুই ইন্টারনেট ও ইন্টারনেটকেন্দ্রিক স্মার্ট ডিভাইসের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ছোঁয়া শুধুমাত্র প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নয়, আমাদের জীবনধারণের সব ক্ষেত্রকেই পরিবর্তন করে দিচ্ছে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের আর একটি সময়োপযোগী পরিকল্পনা হলো 'স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১' রূপকল্প। গত বছরের ৭ এপ্রিল বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের তৃতীয় সভায় 'স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১' রূপকল্পের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একই বছরের ১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দেন, ২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণের, যার মূল স্তম্ভ চারটি-স্মার্ট নাগরিক,স্মার্ট সরকার, স্মার্ট অর্থনীতি ও স্মার্ট সমাজ।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও স্মার্ট বাংলাদেশবান্ধব পরিকল্পনা, নীতি ও কৌশল গ্রহণে ডিজিটাল বাংলাদেশের উদ্যোগগুলোকে স্মার্ট বাংলাদেশের উদ্যোগের সঙ্গে সমন্বিত করা হচ্ছে। 'স্মার্ট বাংলাদেশ : আইসিটি মাস্টারপ্ল্যান ২০৪১' তৈরির মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিকস, মেশিন লার্নিং, ইন্টারনেট অব থিংস, ব্লকচেইন, ন্যানোটেকনোলজি, থ্রিডি প্রিন্টিংয়ের মতো আধুনিক ও নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানি, স্বাস্থ্যসেবা, যোগাযোগ, কৃষি, শিক্ষা, বাণিজ্য, পরিবহন, পরিবেশ, অর্থনীতি, গভর্ন্যান্সসহ বিভিন্ন খাত অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করছে। স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ রূপকল্পের কর্মপরিকল্পনায় স্থান পাচ্ছে তারুণ্যের মেধা, উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতার বিকাশ এবং আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলা এবং উদ্ভাবনী জাতি গঠন। চারটি মূল ভিত্তির ওপর নির্ভর করে ২০৪১ সাল নাগাদ আমরা একটি সাশ্রয়ী, টেকসই, বুদ্ধিদীপ্ত, জ্ঞানভিত্তিক, উদ্ভাবনী স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

স্মার্ট বাংলাদেশের রূপরেখা সর্বত্র প্রযুক্তিনির্ভর। স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ বাস্তবায়নে সরকার ইতোমধ্যে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হাতে নিয়েছে, যার মধ্যে ডিজিটাল ইনক্লুশন ফর ভালনারেবল এক্সপেশন (ডাইভ)-এর আওতায় আত্মকর্মসংস্থানভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ; 'ওয়ান স্টুডেন্ট, ওয়ান ল্যাপটপ, ওয়ান ড্রিম'-এর আওতায় শিক্ষার্থীদের অনলাইন শিক্ষাকার্যক্রম নিশ্চিত করা; স্মার্ট সরকার গড়ে তুলতে ডিজিটাল লিডারশিপ একাডেমি স্থাপন। রোবটিকস ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এ যুগে আমাদের সামনে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। শ্রমনির্ভর আমাদের যে অর্থনীতি, তাতে প্রযুক্তিতে উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে তার বিকল্প উপায় আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। ধীরে ধীরে বিশ্বজুড়ে শ্রমনির্ভর কাজে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ছে এবং বাড়তে থাকবে। এই প্রযুক্তির বিশ্বব্যবস্থায় টিকে থাকার জন্য, মধ্যম থেকে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে মেধা ও জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতি কতটা কাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ জন্য প্রয়োজন দক্ষ ও কর্মঠ জনশক্তি। জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি দ্রুত পরিবর্তনশীল।

বিশ্বব্যাংকের মতে, জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতির চারটি মূল স্তম্ভ রয়েছে। তা হলো- প্রতিষ্ঠান (বিশ্ববিদ্যালয়, ল্যাবরেটরিজ, ইনকিউবেটরস ইত্যাদি), উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেম, মানসম্মত শিক্ষা এবং পর্যাপ্ত ও আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো। এই চারটি স্তম্ভ ব্যাপক পরিসরে দক্ষ জনবল তৈরিতে, উদ্যোক্তাদের পণ্য ও সেবার মানোন্নয়নে কাঠামোগত সুবিধা দেবে। পরিবর্তিত এই অর্থনীতিতে দেশের শ্রমবাজারে সমন্বয় ও পুনর্বিন্যাস ঘটবে। সেই পরিবর্তিত শ্রমবাজারে টিকে থাকতে হলে দেশের জনগণকেও হতে হবে 'স্মার্ট' ও দক্ষ। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে তাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। প্রচলিত ধারার শিক্ষায় নিয়োজিত জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জ্ঞানকর্মী বানাতে হলে প্রথমে প্রচলিত শিক্ষার ধারাকে বদলাতে হবে। আমাদের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীলতা ও কায়িক শ্রম কমিয়ে ডিজিটাল প্রযুক্তিতে দক্ষ তথা জ্ঞানকর্মীতে রূপান্তর করতে হবে। এই জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে জ্ঞানচর্চার কোনো বিকল্প নেই। আগামী বছরগুলোয় সারা বিশ্বে কোন ধরনের কাজের চাহিদা বাড়তে পারে, কোন ধরনের কাজের চাহিদা কমতে পারে, সে বিষয়টি মাথায় রেখে দেশের অর্থনীতির কাঠামোগত ও শিক্ষাগত রূপান্তরও করতে হবে।

আন্তর্জাতি প্রতিষ্ঠান ওকলার জুলাই ২০২৩-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বের ১৪৩টি দেশের মধ্যে মোবাইল ইন্টারনেটের গতিতে বাংলাদেশের অবস্থান ১২০তম। আর ফিক্সড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের গতিতে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৬তম। ২০৪১ সালে স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োন আমাদের প্রয়োজন উচ্চগতিসম্পন্ন, সাশ্রয়ী এবং নিরবচ্ছিন্ন ব্র্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ, যা দেশজুড়ে বিস্তৃত থাকবে। সেই সঙ্গে সারা দেশে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) আইসিটি জরিপ ২০২২-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ৩৮ দশমিক ৯ শতাংশ। জিএসএমএ, লন্ডন কর্তৃক প্রকাশিত দ্য মোবাইল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০২০ অনুযায়ী, বাংলাদেশে শতকরা ৮৬ শতাংশ পুরুষের

মোবাইল ফোন আছে, যেখানে নারী মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৬১ শতাংশ; অর্থাৎ ২৯ শতাংশ লিঙ্গবৈষম্য এখানে বিদ্যমান রয়েছে। মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য আরও প্রকট; যা প্রায় ৫১.৫ শতাংশ। স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য অর্জনে এ লিঙ্গবৈষম্য দূর করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। দেশের নারী সমাজকে পেছনে রেখে কোনোভাবেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে না।

স্মার্ট বাংলাদেশের রূপকল্প বাস্তবায়নে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় যথেষ্ট বিনিয়োগ করতে হবে, বিশেষ করে প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিষয়ক বিভাগগুলোয় আধুনিক ল্যাবরেটরি গঠনে সব ধরনের সহযোগিতা দিতে হবে, পর্যাপ্ত আইসিটি অবকাঠামো সৃষ্টি এবং নিরবচ্ছিন্ন উচ্চগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট কানেকটিভিটি স্থাপন করতে হবে এবং গবেষণা খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। পর্যাপ্ত বিনিয়োগ, দক্ষ শিক্ষক ও গবেষক নিয়োগ এবং গবেষণায় অর্থায়ন ও উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিশ্বমানের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। আন্তর্জাতিক স্বনামধন্য গবেষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে কাজের মাধ্যমে জ্ঞানচর্চা ও উদ্ভাবনকে প্রাধান্য দিতে হবে। ইন্ডাস্ট্রি, সরকার এবং একাডেমিয়ার মধ্যে মেলবন্ধন স্থাপন করে দেশের সমস্যা সমাধানে কাজ করতে হবে। সেই সঙ্গে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে মৌলিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহযোগিতা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুদীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ছিনিয়ে এনেছিলেন আমাদের স্বাধীনতা- জাতিকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন সোনার বাংলার। তার দিক-নির্দেশনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে। জাতির জনকের সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে তিনি ইতোমধ্যে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন করেছেন। সামনে লক্ষ্য- স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প ২০৪১। দেশের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে ২০৪১ সাল নাগাদ সাশ্রয়ী, টেকসই, জ্ঞানভিত্তিক, উদ্ভাবনী স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হব বলে আমরা আশাবাদী।

এ বছর প্রথম বারের মতো কাজের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করেছে মাইক্রোসফট। তারা বিশ্বাস করে, অনেকেই একমত হবেন যে আমরা এখন একটা বিশাল প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। এটা একাধারে উত্তেজনাপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর সময়। এআই সামনের দিনগুলোতে কেমন রূপ নেবে, তা একদমই অনিশ্চিত। তবে একটা বিষয় আগের চেয়ে পরিষ্কার যে, এআই ভবিষ্যতে আমাদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রোডাক্টিভিটি ছাড়াও অজানা অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপক সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে। আমরা সর্বদা একটা নীতিতে বিশ্বাস করি উদ্ভাবনই অগ্রগতির চাবিকাঠি। এজন্য আমি মাইক্রোসফট শুরু করেছি। এ কারণেই মেলিন্ডা ও বিল গেটস দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে গেটস ফাউন্ডেশন পরিচালনা করছেন। আর এ কারণেই গত শতাব্দীতে বিশ্ব জুড়ে জীবনযাত্রার মান কিছুটা হলেও উন্নত হয়েছে বলে দাবি তাদের।

আমাদের এই বিশ্বে সম্পদ বেশ সীমিত। এমতাবস্থায় আমাদের সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। ব্যয়কৃত প্রতিটি ডলার থেকে সর্বাধিক লাভের চাবিকাঠি হলো উদ্ভাবন। এই মুহূর্তে এআই এমন গতিতে নতুন আবিষ্কারের হারকে ত্বরান্বিত করে চলেছে, যা আমরা এর আগে কখনো দেখিনি। এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় সাফল্যগুলোর মধ্যে একটা হলো নতুন ওষুধ তৈরি করা। এআই প্রযুক্তি ওষুধ আবিষ্কারের প্রক্রিয়ার গতি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দিতে পারে এবং কিছু কোম্পানি ইতিমধ্যে এই প্রযুক্তির সাহায্যে ক্যানসারের ওষুধ নিয়ে কাজ করছে। গেটস ফাউন্ডেশন এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে এইডস, যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়ার মতো স্বাস্থ্যসমস্যা মোকাবিলার জন্য কাজ করছে। আমার ধারণা, নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে এআই বিপুল সম্ভাবনা বয়ে আনবে। সম্প্রতি সেনেগাল ভ্রমণের সময় উন্নয়নশীল দেশগুলোর বেশ কয়েক জন উদ্ভাবকের সঙ্গে দেখা করেছি। তারা তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়ের লোকদের উপকার করার উদ্দেশ্যে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে গবেষণাকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের বেশির ভাগ কাজ এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, তবে আশা করা যায়, চলতি দশক শেষ হওয়ার আগেই তারা অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

তারা কত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন, তা দেখে আমি অবাক না হয়ে পারি না। আমরা যে দলগুলোর সঙ্গে দেখা করেছি, তারা গবেষণা করছে এআই কীভাবে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী প্যাথোজেনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবে, মানুষ কীভাবে তাদের এইচআইভির ঝুঁকি আরো ভালোভাবে মূল্যায়ন করতে পারবে, স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে চিকিৎসা তথ্য কীভাবে আরো সহজলভ্য করে তোলা সম্ভব। উন্নয়নশীল দেশগুলোর উদ্ভাবকেরা যেভাবে তাদের দেশের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার চেষ্টা করছেন, তা দেখে আমরা সবাই সত্যিই বিস্মিত হয়েছি।

ভারতে প্রতি দুই মিনিটে একজন নারী সন্তান প্রসবের সময় বা গর্ভাবস্থায় মারা যান। ভারতের একটা দল এই প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের চেষ্টা করছে। এটা ইংরেজি ও তেলেগু উভয়

ভাষাতেই ব্যবহার করা যেতে পারে। এর সবচেয়ে ভালো দিক হলো এটার ইউজার ইন্টারফেস এতটাই সহজ যে, কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়াই যে কেউ এটা ব্যবহার করতে পারবে। এ ধরনের প্রকল্পের জন্য আমাদের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। আমাদের সামনে অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। যেমন গুণমান ঠিক রেখে কীভাবে এই প্রযুক্তি বৃহৎ সংখ্যায় উৎপাদন করা সম্ভব এবং কীভাবে সেগুলো সময়ের সঙ্গে আপডেট করা যায়, তা নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত গবেষণা ও তহবিল প্রয়োজন।

এসব ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে আমাদের এআই থেকে উদ্ভূত কিছু বিস্তৃত ঝুঁকি মোকাবিলা করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে কীভাবে পক্ষপাত ও হ্যালুসিনেশন প্রতিরোধ করা যায়। হ্যালুসিনেশন বলতে সেই সময়কে বোঝায়, যখন একটা এআই সিস্টেম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এমন কিছু দাবি করে, যা সত্য নয়। চিকিৎসার ক্ষেত্রে এআই ভুল তথ্য প্রদান করলে মানুষের মৃত্যুর ঝুঁকি তৈরি হয়। যদিও কিছু গবেষক মনে করেন, 'হ্যালুসিনেশন এআই প্রযুক্তির অন্তর্নিহিত সমস্যা। তবে এ ব্যাপারে আমি একমত নই। আমি আশাবাদী যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এআই মডেলগুলোকে মিথ্যা থেকে সত্যকে আলাদা করতে শেখানো সম্ভব। ওপেন এআই এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এআই প্রযুক্তি যাদের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হচ্ছে, তারা যেন এর সঠিক ব্যবহার করতে পারে, সেটা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা 'সোমানাসি' নামক একটা এআইভিত্তিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। বর্তমানে যে এআইভিত্তিক শিক্ষা সরঞ্জাম পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেগুলো সত্যিই চমকপ্রদ। কারণ সেগুলো প্রতিটি স্বতন্ত্র শিক্ষার্থীর জন্য তৈরি করা হয়েছে। সোমানাসি শব্দের অর্থ 'একসঙ্গে শিখুন'। কেনিয়ার শিক্ষার্থীদের জন্য এই প্রযুক্তি বেশ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। এটা স্থানীয় পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সমন্বয় করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট মাথায় রাখা হয়েছে, যেন শিক্ষার্থীরা এটা ব্যবহার করার সময় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

অনেক গবেষক দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছি আমরা, যারা কীভাবে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে নতুন প্রযুক্তি স্থাপন করা যায় সে বিষয়ে গবেষণা করছেন। আমরা যদি এখন স্মার্ট খাতে বিনিয়োগ করি, তাহলে এআই ভবিষ্যতে বৈষম্য দূর করে বিশ্বকে আরো ন্যায়সংগত করে তুলতে পারবে। অনেক সময় লক্ষ্য করা যায়, একটা ধনী দেশ এই মুহূর্তে যেসব প্রযুক্তি ব্যবহার করছে, তা দরিদ্র দেশের হাতে যেতে কয়েক বছর সময় লেগে যায়। এআই প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে এই ব্যবধান কয়েক মাসে নামিয়ে আনা সম্ভব। এআই প্রযুক্তি যে গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, তাতে ধারণা করা যায়, তিন বছরের মধ্যে এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। তবে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, এই যাত্রা আমাদের জন্য মোটেও সহজ হবে না।

এই ব্যবধান কমানো সম্ভব হলে বিশ্ব জুড়ে বৈষম্য ঘোচানোর পথ অনেক সহজ হয়ে যাবে। এমন চ্যালেঞ্জিং সময়েও আমরা আশাবাদী, এআই ব্যবহার করে ভবিষ্যৎ পরিবর্তনকারী প্রযুক্তি তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব, যাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য এগুলো অত্যন্ত প্রয়োজন।

ক্যাশলেস অর্থনীতিতে বাংলাদেশ

বাসায় বসে কয়েক ক্লিকে যদি কোনো ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়া যায়, কিংবা কোনো চায়ের দোকানে বসে চা খেতে খেতে টাকা জমা দেওয়া যায়। আবার কোনো চেক না লিখে, লাইনে না দাঁড়িয়ে ব্যাংক থেকে টাকা উঠানো যায় তা হলে তো ঝামেলাই নেই। আর গ্রাহকদের ঝামেলামুক্ত লেনদেন করার জন্য আসছে ডিজিটাল ব্যাংক। হয়তো অনেকের মনে প্রশ্ন উঠবে কীভাবে এই কাজগুলো সম্পন্ন হবে। হ্যাঁ, সব কাজ হবে ইন্টারনেটে। ইন্টারনেটেই এই ডিজিটাল ব্যাংকের অ্যাপ থাকবে। আরও থাকবে ওয়েব সাইট। এই অ্যাপের মাধ্যমেই সব কাজ করা যাবে। এই ডিজিটাল ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট খুলতে কোনো কাগজপত্র

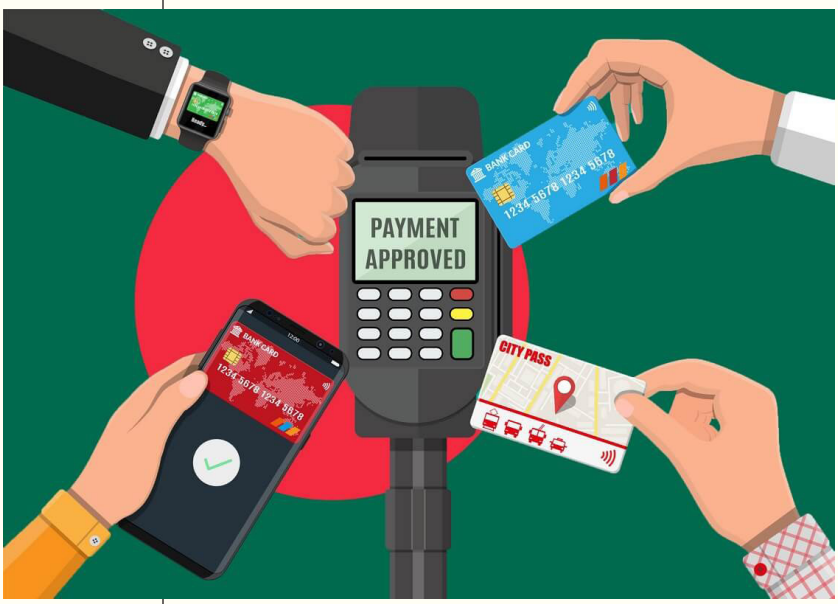

নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করা লাগবে না। অ্যাকাউন্ট খুলতে হলে শুধু ব্যাংকের নিজস্ব ওয়েব সাইটে কিংবা অ্যাপে ক্লিক করলেই তারা বলে দেবে কী কী কাগজপত্র প্রয়োজন। তবে অ্যাকাউন্ট খুলতে ব্যাংকের অ্যাপে নিজের নাম, ঠিকানাসহ অন্যান্য কাগজপত্র আপলোড করলেই অ্যাকাউন্ট খোলা হয়ে যাবে।

আবার কেউ যদি এই ডিজিটাল ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে চায় তাকে একইভাবে নির্দিষ্ট কাগজপত্র আপলোড করতে হবে। এখানে ঋণ নেওয়ার জন্য কোনো ধরনের তদবির বা অন্যভাবে টাকা খরচ করতে হবে না। তবে এই ব্যাংক থেকে ঋণ পাবেন তারাই যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। বড় বড় ব্যবসায়ীদের কোনো ধরনের ঋণ দেওয়া হবে না। এমনকি কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য ঋণ দেওয়া হবে না।

যিনি ঋণের জন্য আবেদন করবেন তার কাগজপত্র আপলোড হয়ে গেলে সেই তথ্য অনেকটা যাচাই-বাছাই করা হবে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, তিনি কোনো ধরনের ঋণ খেলাপি কি না তা প্রথমে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবি থেকে যাচাই করা হবে। এর জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। যে পদ্ধতির মাধ্যমে দ্রুত কাজটি সম্পন্ন করা

হবে। এই ব্যাংকের কার্যক্রম কোনো কাগজ-কলমে হবে না। তবে এই ব্যাংকের যে প্রধান কার্যালয় থাকবে সেখানে প্রয়োজন অনুযায়ী কাগজ কলমের প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু বেশিরভাগ কাজ সম্পন্ন হবে প্রযুক্তির ভিত্তিতে। এই ডিজিটাল ব্যাংকের কোনো কার্যক্রম সম্পর্কে কোনো গ্রাহকের কোনো ধরনের অভিযোগ থাকলে তা সশরীরে অভিযোগ দেওয়া যাবে। এর পাশাপাশি অ্যাপের মাধ্যমে অভিযোগ দেওয়া যাবে। আর এসব অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করা হবে।

দৈনন্দিন লেনদেনের জন্য অ্যাপের মাধ্যমে বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। আর অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে। প্রবাসীদের রেমিট্যান্স গ্রহণের ক্ষেত্রে এই ডিজিটাল ব্যাংক বিশেষভাবে অন্য ব্যাংকের মতো কাজ করবে। তবে কোনো কাগজপত্র নিয়ে কাউকে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে না। টাকা তোলার জন্য আপাতত বিভিন্ন ব্যাংকের এটিএম বুথ ব্যবহার করতে পারবেন গ্রাহক। এমনকি বিকাশ, নগদ ও উপায় ব্যবহার করতে পারবেন।

ডিজিটাল ব্যাংক পাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি গাইড লাইন বেঁধে দেয়। এর ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ গত ২২ অক্টোবর অনুমোদন দেয়। তবে গাইডলাইন অনুযায়ী আবেদনকারীকে বেশ কিছু শর্ত দেয়। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, প্রযুক্তিগতভাবে অভিজ্ঞতা। শুধু তাই নয়, আবেদনকারী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক থেকে শুরু করে বিভিন্ন কর্মকর্তার নিয়োগপত্র সংযুক্ত করতে হয়েছে। যাদের ভিত্তিতে এই ডিজিটাল ব্যাংক পরিচালিত হবে। আর শর্তের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, আবেদনকারীর ব্যাংকের কোনো কর্মকর্তা ঋণখেলাপি হতে পারবেন না।

প্রতিটি স্পন্সরের জন্য নির্ধারিত মূলধন ৫০ লাখ টাকা। আর ব্যাংকের মূলধন রাখা হয়েছে ১২৫ কোটি টাকা। যদি অনুমোদনপ্রাপ্ত কোনো ব্যাংক যদি মনে করে তাদের মূলধন আরও জোগান দিতে হবে। তা হলে সেই মূলধন জোগানের জন্য কোনো ব্যক্তিগত ঋণ নেওয়া যাবে না। আর ঋণের টাকা তাদের আয়কর ফাইলে দেখাতে হবে।

মোটকথা ডিজিটাল ব্যাংকগুলো প্রযুক্তিগতভাবে পরিচালিত হবে। কোনো শাখা বা উপশাখা ছাড়াই এই ব্যাংক পরিচালিত হবে। এই ব্যাংকের প্রধান লক্ষ্য হবে গ্রামের মানুষের কাছে এই ব্যাংকের সেবা পৌঁছে দেওয়া। আর তা হবে কোনো কাগজ ছাড়াই-যা বাংলাদেশের অর্থনীতি হবে ক্যাশলেস।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অভাবনীয় প্রসার

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অভাবনীয় প্রসারের ঝুঁকি, নিয়ন্ত্রণ ও আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যে লন্ডনে দুই দিনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নভেম্বরে যুক্তরাজ্যের একটি পার্কে বিশ্বের প্রথম এআই সেফটি সামিট আয়োজন করেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। এ প্রযুক্তি ভুল কারও হাতে গেলে তা ক্ষতিকারক কাজের উদ্দেশে ব্যবহারের সতর্কবার্তাও দেওয়া হয় সম্মেলনে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চীনসহ অনেকেই এআই ঝুঁকি নিয়ে কথা বলেছেন ও আশু সমাধানের পরিকল্পনা করতে একত্রে কাজ করতে সম্মত হয়েছেন। 'ডিপফেক'-এর বিষয়টি ২০১৭ সালে প্রথম প্রকাশ্যে এলেও এআই প্রযুক্তি জনপ্রিয় হওয়ার পাশাপাশি এর অপব্যবহারও বেড়েছে। ডিপফেক ব্যবহার করে তৈরি করা হচ্ছে ভুয়া ভিডিও। গত এক বছর বহুল আলোচিত বিষয় ছিল ডিপফেক প্রযুক্তি। ডিপফেক প্রযুক্তি হলো এমন এক প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে নকল ভিডিও তৈরি হয়, অর্থাৎ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে আপনার মুখের সঙ্গে অন্য কোনো ব্যক্তির শরীর জুড়ে দিয়ে ভিডিও বানানো হয়। এ প্রযুক্তি দিয়ে হুবহু নকল ভিডিও বানানো সম্ভব। মেশিন লার্নিং প্রয়োগের মাধ্যমে দিন দিন প্রযুক্তিটি আরও উন্নত হচ্ছে এবং নিখুঁতভাবে নকল ভিডিও বানানো হচ্ছে।

এসব ভিডিওতে নির্দিষ্ট ব্যক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কৃত্রিমভাবে নড়াচড়া করানোর পাশাপাশি কণ্ঠস্বর ব্যবহার করায় অনেকেই বুঝতে পারেন না, এটি নকল ভিডিও। ফলে বিভ্রান্তি তৈরির পাশাপাশি প্রতারণার ঘটনাও ঘটছে। তাই বছরজুড়েই ডিপফেক ভিডিও নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা তৈরি হয়েছে। নভেম্বর থেকে এযাবৎকালে ডিপফেক ভিডিওর শিকার হন

বলিউড তারকা রাশমিকা, ক্যাটরিনা, কাজল, আলিয়া এবং সর্বশেষ প্রিয়াঙ্কা চোপড়া।

গত বছরের আরেকটি বড় ঘটনা ছিল স্যাম অল্টম্যানের ছাঁটাই। নভেম্বরের শেষে আচমকাই ওপেনএআইয়ের সিইও পদ থেকে সরানো হয় চ্যাটজিপিটির 'স্রষ্টা' অল্টম্যানকে। স্যামের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতার ওপর আস্থা হারিয়েছেন ওপেনএআইয়ের পরিচালকরা, সেই কারণেই তাকে সিইও পদ থেকে ছাঁটাই করা হয়। অল্টম্যানের জায়গায় আসেন মিরা মুরাটি। বরখাস্তের ঘটনায় প্রযুক্তি বিশ্বে ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। কোম্পানির প্রায় সব কর্মী এক চিঠিতে স্বাক্ষর করেন, যেখানে তারা হুমকি দেন, তাকে সিইও পদে না ফেরালে তারা ওপেনএআই ছেড়ে মাইক্রোসফটের প্রস্তাবিত অল্টম্যানের নতুন এআই গবেষণা দলে যোগ দেবেন। এমন হুমকির পরপরই অল্টম্যানকে নিজ পদে ফেরাতে বাধ্য হয় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইউনিভার্সাল চার্জার হিসাবে বাধ্যতামূলক হয় টাইপ সিকে। গত বছর এ চার্জার নিয়ে আলোচনা ছিল বিশ্বজুড়ে। কেননা মার্কিন প্রযুক্তি জায়ান্ট অ্যাপল ও তাদের এ বছরে আসা আইফোন ১৫ সিরিজে

টাইপ সি চার্জিং পোর্ট দিতে বাধ্য হয়েছে। মূলত ব্যবহারকারীদের উন্নত পরিষেবা দিতেই এ আইন কার্যকর করেছে ইইউ। সব স্মার্ট ডিভাইসের জন্য একই ধরনের চার্জার একদিকে যেমন ব্যবহারকারীর জীবন সহজ করবে, অন্যদিকে কমবে পরিবেশ দূষণের মাত্রা। এ বছরের আগস্টে সোশ্যাল মিডিয়ার দুই মহারথী ইলন মাস্ক ও ফেসবুকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মার্ক জাকারবার্গ খাঁচাবদ্ধ রিংয়ে লড়াইয়ের ঘোষণা দেয়। এরপর থেকেই টেক বিশ্বের এ দুই শীর্ষনেতার সম্ভাব্য 'কেইজ ফাইট' নিয়ে চলছে জোর আলোচনা। মাঝে জানা গিয়েছিল, তাদের এ ফাইট যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাসে হতে পারে। যদিও শেষমেশ এ লড়াই না হলেও এটি নিয়ে প্রযুক্তি বিশ্বে বেশ আলোড়ন তৈরি হয়।

গতবছর ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে মাস্কের স্টারলিংক স্যাটেলাইটের নেটওয়ার্ক। এমনকি দুর্গম ও যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকাগুলোতেও গিয়ে পৌঁছেছে ইন্টারনেট সংযোগ। এ বছর মহাকাশ কক্ষপথে স্টারলিংকের স্যাটেলাইট গত বছরের তুলনায় তিনগুণ বেড়েছে। সংখ্যায় প্রায় পাঁচ হাজার; প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যামাজনের প্রজেক্ট কুইপার এখন পর্যন্ত শুধু কয়েকশ স্যাটেলাইট বসাতে পেরেছে। মাস্ক মালিকানাধীন কোম্পানি স্পেস এক্স গোটা বিশ্ব ও মহাকাশে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো নিয়ে কাজ করছে। এর মধ্যে মহাকাশ খাতে রাজত্ব করছে কোম্পানিটি। স্পেস নিউজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এ বছর মহাকাশ মিশনের প্রায় অর্ধেকই স্পেসএক্স-এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের সরকারকে জাতীয় নিরাপত্তা সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যে সম্প্রতি 'স্টারশিল্ড' নামের স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক গঠনের ঘোষণাও দিয়েছে কোম্পানিটি। এ ঘোষণাকে সামরিক খাতের বেসরকারিকরণ বলে আখ্যা দিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদপত্র ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস। স্টারশিল্ডকে ডিজাইন করা হয়েছে সরকারি ও সামরিক কাজের জন্য। ভূপৃষ্ঠে প্রভাব ফেলার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে নেই মাস্ক, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় ইভি চার্জিং স্টেশন নিয়ন্ত্রণ করছে টেসলা। এমনকি বৈশ্বিক নেতারাও নিজ নিজ দেশে কোম্পানিটির 'গিগাফ্যাক্টরি' নির্মাণের প্রস্তাব দিচ্ছেন।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন শেখ হাসিনা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কিংবা 'স্মার্ট বাংলাদেশ' এখন আর কেবল চটকদার শব্দ নয়। নয় কোনো অধরা স্বপ্ন। এটি এখন স্বপ্নের ডানায় ভর করে আসা এক স্পর্শযোগ্য, এক বাস্তবতা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দীর্ঘতম সময় ধরে সর্বাধিক দায় ও দক্ষতার সঙ্গে দেশ পরিচালনা করছেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী রচনার দায়িত্ব পালন করে চলেছেন, যে পৃথিবীতে বাংলাদেশের পরিচয় হবে একটি স্মার্ট দেশ হিসেবে। আর এই স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরন্তর বিনিয়োগ করে চলেছেন তাঁর মেধা, প্রজ্ঞা, পরিশ্রম, বুদ্ধিমত্তা, সাহস ও সৃজনশীলতা। উইকিলিকসের এক সাম্প্রতিক জরিপে তাঁকে বিশ্বের সবচাইতে দীর্ঘমেয়াদি নারী প্রধানমন্ত্রী এবং বিশ্ব নারী জাগরণের আইকন হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। বিশ্বখ্যাত মার্কিন বিজনেজ ম্যাগাজিন ফোরবস বিশ্বের ১০০ জন প্রভাবশালী নারীর তালিকায় শেখ হাসিনাকে রেখেছে। শেখ হাসিনার ব্যক্তিত্ব বস্তুত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সুগভীর জ্ঞান, চৌকস নেতৃত্ব আর সর্বজনীন মানবিক বোধের যোগফল। একজন সত্যিকারের দূরদর্শী নেত্রী হিসেবে তিনি যে রাজনৈতিক উদ্ভাবনের একটি উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা দেশের অন্য কোনো রাজনীতিবিদের সঙ্গে তুলনীয় নয়। তাঁর এই সফট স্কিলই একদিন বাস্তবতা দেবে স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নসৌধের, যেমন দিয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশের।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের দীর্ঘতম সময়ের প্রধানমন্ত্রী। প্রথম দফায় ৫ বছর (১৯৯৬-২০০১) এবং দ্বিতীয় দফায় ১৫ বছর, মোট ১৯ বছর সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করে ২০ বছরের নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ করতে চলেছেন। তাঁর শাসনকালের এই দীর্ঘতা কেবল সময়ের বিচারেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, কীর্তি-কর্মের বিচারেও অগ্রগণ্য। বাংলাদেশের প্রায় সব বৃহত্তম সরকারি সাফল্যকর্ম- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, কর্ণফুলী টানেল, পায়রা বন্দর, রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট, সবই শেখ হাসিনার অবদান। চৌকস নেতৃত্ব, সুনিপুণ পরিকল্পনা এবং কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে তলাবিহীন ঝুড়ির তকমা মিথ্যা প্রমাণ করে, তাঁর উদ্ভাবিত উন্নয়নের রোডম্যাপ ধরে তিনি বাংলাদেশকে টেনে তুলেছেন উন্নয়নশীল দেশের সারণিতে। এলডিসির তালিকা থেকে এনালগ বাংলাদেশকে উন্নীত করেছেন ডিজিটাল বাংলাদেশে। সেই হাসিনা যখন আরও দৌড়াতে চান, আরও কিছুটা এগোতে চান, রবার্ট ফ্রস্টের ভাষায়, ঘুমুবার আগে- কিংবা চিরনিদ্রার আগে- তাঁর স্বপ্নময় ডিজিটাল বাংলাদেশকে উন্নীত করতে চান স্মার্ট বাংলাদেশে- তখন একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে তা গুরুত্বের সঙ্গে নেয়া আমাদের জাতীয় কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আর সে জন্যই 'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এর একটা ধারণাগত রূপরেখা দাঁড় করানো দরকার। এই প্রবন্ধ তারই এক ক্ষুদ্র প্রয়াস।

১২ ডিসেম্বর ২০০৮, জননেত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপরেখা নিয়ে 'ভিশন-২০২১'-এর ধারণা সংবলিত পরিবর্তনের ইশতেহার ঘোষণা করেন। ১৪ বছর পর, 'ভিশন-২০২১'-এর সফল বাস্তবায়নের পর আবার আরেক ২০২২ সালের ডিসেম্বরের ১২ তারিখে তিনি একটি 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গঠনে তাঁর সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ঘোষণা করেন।

স্মার্ট বাংলাদেশ! এক অদ্ভুত নজরকাড়া শব্দ। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ

দিবস-২০২২' উদযাপনের অংশ হিসেবে একটি আইসিটি এবং ইনকিউবেশন সেন্টার, একটি হাই-টেক পার্ক এবং একটি ডিজিটাল জাদুঘর উন্মোচন করার সময় তিনি ঘোষণা করেন, 'আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করব এবং সেটি হবে স্মার্ট বাংলাদেশ।' 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বলতে তিনি যা বোঝাতে চান তা খুব স্পষ্ট। দ্রুত বর্ধনশীল প্রযুক্তির এই স্বর্ণযুগে জীবন ও জগতের সবকিছুকে চলমান প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত করা উচিত এবং বিদ্যমান প্রযুক্তির সর্বোচ্চ সুবিধাগুলো গ্রহণ করা উচিত।

তবে এটি চলমান ভিশন-২০৪ থেকে আলাদা কোনো নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নয়। বরং একটি উন্নত-প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়ন মন্ত্র, যা 'ভিশন-২০৪১' বাস্তবায়নের কর্মকাণ্ডকে নতুন গতি দেবে। স্মার্ট বাংলাদেশের যাত্রা একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি এবং বহুমাত্রিক উদ্ভাবক সমাজের সূচনা করেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তর ভিশন-২০২১ থেকে ভিশন-২০৪১ ডিজিটাল অর্থনীতি থেকে জ্ঞান অর্থনীতিতে। শেখ হাসিনা বাংলাদেশের জনগণের অব্যাহত সমর্থনকে তাঁর পরিকল্পনার সাফল্যের চাবিকাঠি মনে করেন এবং বাংলাদেশের তরুণদের '২০৪১ সালের

সৈনিক' হিসেবে উল্লেখ করেন, যা তিনি আশা করেন, নিজেদের স্মার্ট নাগরিক হিসেবে প্রস্তুত করে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরবেন এবং দেশকে নিয়ে যাবেন এক গর্বিত অবস্থানে, যাকে নাম দেয়া যায় স্মার্ট বাংলাদেশ। একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে শেখ হাসিনা সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশ বিষয়ে এক অগ্রসর ভাবনার মানুষ। বর্তমানে আমাদের জীবনে বিপ্লব সৃষ্টিকারী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিকস, ইন্টারনেট অব থিংস, স্বয়ংক্রিয় যানবাহন, ন্যানো প্রযুক্তি, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং থ্রিডি প্রিন্টিংসহ আজকের দিনের উচ্চ প্রযুক্তিনির্ভর অভূতপূর্ব, বিস্ময়কর আবিষ্কারগুলো সম্পর্কে তিনি ভালোভাবে জানেন। তিনি জানেন একটি দেশকে কীভাবে সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে টিকে থাকার জন্য স্মার্ট হতে হয়। নতুন প্রযুক্তির এই যুগে শুধু প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত একটি দেশই টিকে থাকার সুযোগ পাবে।

'স্মার্ট বাংলাদেশ' ধারণাটি 'ডিজিটাল বাংলাদেশের' উন্নয়ন একটি অগ্রসর পর্যায়। তথ্য ও যোগাযোগ পদ্ধতির হাত ধরে আমাদের জাতীয় উনয়নের অগ্রযাত্রার এক কাঙ্ক্ষিত মাত্রা। এর পেছনে কাজ করেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী নেতৃত্ব, তাঁর পুত্র এবং প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের নিরন্তর প্রচেষ্টা আর উন্নয়ন-প্রত্যাশী এক দেশ মানুষের প্রবল সদিচ্ছা।

বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশ রচনা করে তাকে মানচিত্রে স্থান দিয়েছিলেন এবং শেখ হাসিনা হয়েছেন এর উন্নয়নের মুকুটহীন সম্রাজ্ঞী, আর তাঁর সুযোগ্য পুত্র জয় একটি তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর সমাজের কল্পনা করছেন, যা গত এক দশক ধরে বিশ্বব্যাপী আলোচনার শীর্ষে রয়েছে। জয় বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো নিয়ে এসেছেন সিলিকন ভ্যালির স্পিরিট- উচ্চ প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, উদ্যোগ, পুঁজি ও সোশ্যাল মিডিয়া এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প বাস্তবায়ন তা সফলভাবে প্রয়োগ করেছেন।

'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এর ধারণাটি চারটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যেমন স্মার্ট নাগরিক তৈরি করা, একটি স্মার্ট সরকার নিশ্চিত করা, একটি স্মার্ট অর্থনীতি চালানো এবং একটি স্মার্ট সমাজ তৈরি করা। একজন স্মার্ট নাগরিক মানে আইসিটি জ্ঞানসম্পন্ন নাগরিক এবং উন্নত মানবসম্পদ। স্মার্ট নাগরিক তৈরির লক্ষ্যে বাংলাদেশ শতভাগ ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ৫০ মিলিয়ন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী এবং ১৮৬ মিলিয়ন মোবাইল গ্রাহক বাংলাদেশকে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পঞ্চম বৃহত্তম এবং বিশ্বের নবম বৃহত্তম মোবাইল বাজারে পরিণত করেছে। বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ফাইবার অপটিক সাবমেরিন ক্যাবল ব্যান্ডউইথ এবং সবচেয়ে উন্নত ইন্টারনেট ট্রানজিট সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণকে 'ইনফরমেশন সুপার হাইওয়েতে সংযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এটা ভাবতেই শিহরণ জাগে যে, বাংলাদেশ তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে, যার মাধ্যমে আমরা ১২ টেরাবাইট ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করতে পারব এবং নিজেদের স্মার্ট নাগরিকে পরিণত করতে পারব।

এ ছাড়া আমরা ই-গভর্নেন্সে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছি, যা ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। নাগরিকদের ৬০০টিরও বেশি ডিজিটাল পরিষেবা প্রদানের জন্য সারা দেশে প্রায় ৬০০০টি ডিজিটাল সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ডিজিটাল বিভাজনের সমস্যাটি যথাযথভাবে সমাধান করা হচ্ছে। সরকারি সেবা প্রদান, তথ্য বিনিময়, লেনদেন, পূর্বে বিদ্যমান সেবা এবং তথ্য পোর্টালগুলোর একীকরণের জন্য যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে ই-গভর্নেন্সের অনুশীলনকে আরও উন্নত করা যেতে পারে। এটি পুরো প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে সুবিধাজনক, দক্ষ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করে তুলবে এবং এর ফলে একটি স্মার্ট সরকার হিসেবে কাজ করতে সহায়তা হবে।

একটি দক্ষ ও ডিজিটাল-প্রস্তুত কর্মীবাহিনী এবং প্রযুক্তি-সমর্থিত কৃষি-শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ তৈরি করে একটি স্মার্ট অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য সরকার বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রতিবছর পাঁচ

লাখেরও বেশি স্নাতক তৈরি হচ্ছে, যার মধ্যে প্রায় পঁচাত্তর হাজার তথ্য প্রযুক্তি-সক্ষম পরিষেবা (আইটিইএস)প্রাপ্ত পেশাদার জনশক্তি হিসেবে প্রশিক্ষিত। অক্সফোর্ড ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের মতে, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অনলাইন কর্মীর পুল রয়েছে বাংলাদেশে। প্রায় ৬ লাখ ৫০ হাজার ফ্রিল্যান্সার আউটসোর্সিং সেক্টও থেকে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করছে। এক হাজার পাঁচশত কোটি টাকা বিনিয়োগে সারা দেশে নির্মিত ৩৯টি হাই-টেক বা আইটি পার্কের মধ্যে ৯টিতে ১৬৬টি দেশি-বিদেশি কোম্পানি ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করেছে। ২০ হাজারেরও বেশি মানুষ সবেতন কর্মসংস্থানে এবং ৩২ হাজার দক্ষ কর্মী জনশক্তির পুলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ ছাড়া আইসিটি খাতে ২০ লাখ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ১১ হাজার নারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। দ্রুত বর্ধনশীল আইসিটি শিল্প মানুষকে আর্থিক, টেলিযোগাযোগ এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সজীব ওয়াজেদ জয় আমাদের স্মার্ট অর্থনীতি বিনির্মাণে অনেক অবদান রেখে চলেছেন। তার নেতৃত্বে আমাদের আইসিটি শিল্প একটি বর্ধিষ্ণু শিল্পে পরিণত হচ্ছে। গত এক দশকে বাংলাদেশ প্রযুক্তিগত অগ্রগতিতে একটি বড় অগ্রগতি অর্জন করেছে, যার মধ্যে রয়েছে মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর ক্রমবর্ধমান সংখ্যা, সরকারি পরিষেবাগুলোয় ডিজিটাল সুবিধা প্রদান, মোবাইল ব্যাংকিং এবং আইসিটি রপ্তানি। বর্তমানে বাংলাদেশে ১২০টিরও বেশি কোম্পানি ৩৫টি দেশে প্রায় ১.৩ বিলিয়ন ডলার মূল্যের আইসিটি পণ্য রপ্তানি করছে এবং ২০২৫ সাল নাগাদ এটি ৫ বিলিয়ন উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে আরও ৩০০টি স্কুল, ১ লাখ ৯০ হাজার ওয়াই-ফাই সংযোগ, এবং ২৫০০টি ডিজিটাল ল্যাব প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে শতভাগ অনলাইন পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে একটি বড় মাপের আইসিটিনির্ভর কর্মসংস্থানের (৩ কোটি) জন্য সরকার বদ্ধপরিকর।

আইসিটি শিল্পের টেকসই প্রবৃদ্ধি ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের একটি স্মার্ট অর্থনীতিতে রূপান্তরের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখবে।

স্মার্ট বাংলাদেশের চতুর্থ স্তম্ভ হলো একটি স্মার্ট সোসাইটি গঠন, যার অর্থ তথ্য-সমাজ থেকে জ্ঞান-সমাজে রূপান্তর। ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা একটি তথ্য সমাজের মৌলিক গুণাবলি অর্জন করেছি। এখন সময় এসেছে জীবনব্যাপী শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানব উন্নয়নের জন্য জ্ঞান তৈরি এবং প্রয়োগের নিমিত্তে তথ্য শনাক্তকরণ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, রূপান্তর, প্রচার এবং ব্যবহার করার স্থায়ী দক্ষতা অর্জনের। সে জন্য দরকার একটি শক্তিশালী সামাজিক দর্শন, যেখানে সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংহতি এবং নাগরিক অংশীদারত্বের সুসমন্বয় থাকে। এগুলোই একটি স্মার্ট সমাজের বৈশিষ্ট্য এবং বাংলাদেশ সেদিকেই এগোচ্ছে।

২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার ১৪টি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প যেমন ডিজিটাল শিক্ষা, ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা, ডিজিটাল কৃষি ইত্যাদি নিশ্চিত করেছে, তেমনি স্মার্ট বাংলাদেশের অপরিহার্য উপাদান হবে স্মার্ট শিক্ষা, স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবা, স্মার্ট কৃষি, স্মার্ট ট্রেড, স্মার্ট পরিবহন এবং স্মার্ট ব্যবস্থাপনা নীতি। ডিজিটাল বাংলাদেশের সফল সমাপ্তির মাধ্যমে প্রযুক্তিভিত্তিক উন্নয়নের ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতা স্মার্ট বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে পথ দেখাবে, যা বাংলাদেশের উন্নয়নের মাঠে একটি বড় উল্লম্ফন। আমরা যদি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং আমাদের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে একটি বর্ধিষ্ণু অর্থনীতি ও অপ্রতিরোধ্য দেশ গড়তে চাই, তাহলে শেখ হাসিনার 'স্মার্ট বাংলাদেশ'- উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই।

মেঘনা ক্লাউড' হবে দেশের প্রথম ক্লাউড ডেটা সেন্টার

দেশের প্রথম ক্লাউড ডেটা সেন্টার হতে যাচ্ছে 'মেঘনা ক্লাউড'। নিজস্ব প্রযুক্তি ও জনবলের মাধ্যমে 'মেইড ইন বাংলাদেশ ক্লাউড' শিরোনামে বাংলাদেশ ডেটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড (বিডিসিসিএল) এবং জেননেক্সট টেকনোলজি লিমিটেড যৌথ উদ্যোগে এই ক্লাউড ডেটা সেন্টার গড়ে তোলা হচ্ছে। সম্প্রতি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের আওতাধীন বিডিসিসিএল এবং জেননেক্সটের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিডিসিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবু সাঈদ চৌধুরী এবং জেননেক্সট টেকনোলজি লিমিটেডের চেয়ারম্যান তৌহিদুল ইসলাম চৌধুরী চুক্তিপত্রে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন। 'মেঘনা ক্লাউড' নিয়ে আইসিটি বিভাগ জানায়, এর মাধ্যমে দেশের ডেটা দেশে রেখেই সরকারি-বেসরকারিসহ যে কোনো প্রতিষ্ঠানকে সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। এর ফলে ক্লাউড টেকনোলজি ক্রয় ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকারের বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে। এ ছাড়া 'মেঘনা ক্লাউড'-এর জন্য ডেটা সেন্টার ইন্ডাস্ট্রির পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে একটি গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে।

প্ল্যাটফর্মটি সার্ভার, স্টোরেজ, নেটওয়ার্কিং সরঞ্জাম এবং সংশ্লিষ্ট সফটওয়্যার প্রযুক্তিসহ ক্লাউড পরিষেবা পরিকাঠামো প্রদান করবে।

এর মাধ্যমে দেশের তথ্য-উপাত্ত দেশে রেখে সরকারি-বেসরকারি উভয় প্রতিষ্ঠানকে সেবা দেওয়া সম্ভব হবে। এই পদক্ষেপটি ক্লাউড প্রযুক্তি ক্রয় এবং ব্যবহার করার জন্য বার্ষিক প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় সাশ্রয় করবে বলে আশা করা হচ্ছে। মাত্র এক বছরের মধ্যে, ক্লাউড প্ল্যাটফর্মটি চালু করা হয়। ২৯ ডিসেম্বর ২০২২-এ, জেননেক্সট মেঘনা ক্লাউডের জন্য বাংলাদেশ ডেটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড (বিডিসিসিএল) এর সাথে একটি যৌথ উদ্যোগের চুক্তি করে। চুক্তির আওতায় জেননেক্সট মেঘনা ক্লাউড নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি বিডিসিসিএলের সাথে সরকারি ও বেসরকারি খাতে ক্লাউড সেবা বিক্রয় ও বিপণন নিশ্চিত করছে। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এর মতে এই মেড ইন বাংলাদেশ ক্লাউড সরকারি ও বেসরকারি খাতের কৌশলগত অংশীদারিত্বের একটি চমৎকার উদাহরণ।

এই উদ্যোগের মাধ্যমে দেশ বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করতে পারে এবং আরও তথ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে। গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে মেঘনা ক্লাউড ডেটা সেন্টার পরিদর্শন শেষে প্রতিমন্ত্রী এ মন্তব্য করেন। পরিদর্শনকালে জেননেক্সট টেকনোলজিস লিমিটেডের চেয়ারম্যান তৌহিদুল ইসলাম চৌধুরী এবং জেননেক্সট টেকনোলজিস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলাভী আজফার চৌধুরী প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এবং আইসিটি সচিব মোঃ সামসুল আরেফিনকে ক্লাউড সেন্টারের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। জেননেক্সট ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম সেট করতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে এবং এটি পরিচালনা করার জন্য একটি দক্ষ কর্মী বাহিনী তৈরি করেছে। জেননেক্সট টেকনোলজিসের চেয়ারম্যান তৌহিদুল ইসলাম চৌধুরী বলেন "মেঘনা ক্লাউড স্মার্ট বাংলাদেশ পদক্ষেপকে এগিয় নিতে সহায়তা করবে। আমরা সরকারি ও বেসরকারি উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য একটি গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রও স্থাপন করছি। এই উদ্যোগ প্রতি বছর প্রায় ৫০০০ শিক্ষার্থীকে ক্লাউড সম্পর্কিত প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ দেবে।" জেননেক্সট টেকনোলজিসের ভাইস চেয়ারম্যান জাভেদ অপগেনহেপেন বলেন, কোম্পানিটি এই প্রকল্পের জন্য আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে প্রায় ৫০ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করছে।

তিনি বলেন, আমরা দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সরকারের সাথে যৌথভাবে কাজ করতে চাই। এই ক্লাউড প্ল্যাটফর্মটি স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।চ তিনি আরও বলেন যে ডেটা সেন্টারটি অন্যান্য দেশ থেকে ক্লাউড প্রযুক্তি ক্রয় এবং ব্যবহারের জন্য ব্যয় করা বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করতে সহায়তা করবে কারণ এখন বাংলাদেশের আর শুধু বিদেশী ডেটা স্টোরেজ সুবিধার উপর নির্ভর করার প্রয়োজন হবে না। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের বেশির ভাগ ডেটা আসে সিঙ্গাপুর সার্ভারের মাধ্যমে। এটি দুই-স্তরের চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। প্রথমত, বর্তমান ব্যবস্থায় সিঙ্গাপুর সরকারের এই সকল ডেটায় অ্যাক্সেস থাকে। সুতরাং, কোনো সংবেদনশীল তথ্য পুনরুদ্ধার করা কঠিন হবে।

দ্বিতীয়ত, ডেটা স্থানান্তরের খরচ বেশি হয় কারণ এটিকে বেশ দীর্ঘ দূরত্ব ভ্রমণ করতে হয় যা সিঙ্গাপুর থেকে বাংলাদেশে স্থানান্তর করতে প্রায় ৬০ মিলি সেকেন্ড লাগে। যদি ডেটা সেন্টারগুলি দেশের সীমানার মধ্যে থাকে তবে এটি এই দুটি সমস্যাকে নিরসন করবে। জেননেক্সট টেকনোলজিসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলাভী আজফার চৌধুরী বলেন মেঘনা ক্লাউড এমন একটি নিরাপত্তা প্যাটফর্ম তৈরি করার আশা করছে যা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা প্রদান করবে।" ২০১৯ সালে, সরকার বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে ফোর টায়ার ন্যাশনাল ডেটা সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে, যা বাংলাদেশের বৃহত্তম। এটি বাংলাদেশ ডেটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড দ্বারা পরিচালিত।

হীরেন পণ্ডিত: প্রাবন্ধিক, রিসার্চ ফেলো ও কলামিস্ট
ফিডব্যাক: hiren.bnnrc@gmail.com
ছবি: ইন্টারনেট